[illegible]
তারিখ ... 05 JUN 198[illegible]
পৃষ্ঠা ... ৬ ...

গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রভাব ও চাহিদা

ডঃ মাহবুব হোসেন

(৩)

প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে আমরা দেখেছি মৌলিক শিক্ষা কৃষি খাতে কর্মসংস্থান ও আয়ের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে কিন্তু ব্যবসায় চাকরি ও বিভিন্ন সেবামূলক কাজে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রামাঞ্চলে পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। প্রবন্ধের শেষ অংশে আমরা শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ থেকে ব্যক্তি ও সমাজের কত লাভ হয় তা হিসাব করব এবং গ্রামে শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধির জন্য করণীয় কিছু বিষয়ের উপর মতামত রাখব।

শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ থেকে লাভ

আমরা গ্রামীণ পরিবারের আয় ব্যয়ের তথ্যের ভিত্তিতে আগেই অনুমান করেছি যে, একজন প্রাথমিক স্কুল উত্তীর্ণ ব্যক্তি অশিক্ষিতের তুলনায় গড়ে বছরে ৮৬০ টাকা বেশী আয় করেন (১৯৮২ সালের মূল্য স্তরে)। ঐ সময়ে সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রপিছু খরচ করেছেন বছরে ১৬৪ টাকা। ছাত্রকে স্কুলে পাঠানোর জন্য পরিবারকেও বই, খাতা ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের জন্য কিছু খরচ করতে হয়। বি, আই, ডি, এস এর আর একটি জরিপ থেকে দেখা গেছে, গ্রামীণ পরিবার প্রাইমারী স্কুলে পাঠরত ছাত্র প্রতি এ সব খাতে বছরে গড়ে ২৫০ টাকা খরচ করে। এসব ছাত্রের বয়স সাধারণতঃ ৬ থেকে ১০ বছরের মধ্যে—সেজন্য তাদের স্কুলে যাওয়ার সুযোগ ব্যয় নেই বলে ধরে নিচ্ছি—অর্থাৎ এই বয়সের শিশু শ্রম দিয়ে পরিবারের জন্য উল্লেখযোগ্য উপার্জন বা ব্যয়ের সাশ্রয় করতে পারে না। একজন ব্যক্তির প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যদি তার ছয় থেকে দশ বছর বয়সকালে বছরে (১৬৪ ২৫০) ৪১৪ টাকা করে বিনিয়োগ করে তার থেকে ১১ হতে ৫৭ বছর বয়স কালে বছরে অতিরিক্ত ৮৬০ টাকা আয় পাওয়া যায়, তাহলে এই বিনিয়োগ থেকে লাভের হার আসে ২৫ শতাংশ। সরকারের তরফ থেকে যে খরচ হয় তা যদি আমরা হিসাব থেকে বাদ দেই তাহলে লাভের হার দাঁড়ায় ৩৫ শতাংশ। শিক্ষায় বিনিয়োগ থেকে উপরোক্ত হারে লাভ হলে শিশুদের প্রাইমারী স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে পরিবারের অবশ্যই উৎসাহিত হওয়ার কথা।

শিশুর দশ বছর বয়স উত্তীর্ণ হবার পর পরিবার তাকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজে নিয়োগ করতে পারে। ফলে তাকে স্কুলে পাঠানোর সুযোগ ব্যয় বাড়ে। আমাদের [illegible] ১৪ বছর বয়সী যেসব শিশু স্কুলে যায় না তাদের সকলেই কোন না কোন অর্থনৈতিক কাজে নিয়োজিত এবং এদের প্রায় ৫১ শতাংশ (২২ শতাংশ নিজ খামারে কৃষিকাজ, ১২ শতাংশ অন্যের খামারে পশুপালন, ৬ শতাংশ মাছ ধরা এবং অন্যান্য অকৃষিজ খাতে) পরিবারের জন্য উপার্জন করে। এদের গড় আয়ের পরিমাণ বছরে প্রায় ১২০০ টাকা (১৯৮২-এর মূল্যস্তরে)। এছাড়া মাধ্যমিক স্কুলে বেতন, বই ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের উপর ছাত্রপিছু পরিবারের খরচ হয় গড়ে আনুমানিক ৮০০ টাকা। প্রাথমিক স্কুল উত্তীর্ণ হওয়ার পরবর্তী তিন বছরে (নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত) শিশুর শিক্ষার জন্য যদি বছরে (১২০০+৮০০) ২০০০ টাকা খরচ করা হয় এবং সে ১৪ থেকে ৫৭ বছর বয়স পর্যন্ত বছরে অতিরিক্ত (১৭২×৮) ১৩৭৬ টাকা করে আয় করে তাহলে বিনিয়োগ থেকে লাভ হয় ১৫ শতাংশ। সরকার মাধ্যমিক স্কুলের জন্য বছরে ছাত্রপিছু খরচ করে ২১০ টাকা (১৯৮২ সালের হিসাবে—এই ব্যয় বর্তমানে বেশ বেড়েছে)। সরকারী খরচ হিসাবে ধরলে নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার বিনিয়োগ থেকে লাভের হার দাড়ায় ১২ শতাংশ। বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির হার যেহেতু বছরে ১০-১২ শতাংশ, উপরোক্ত লাভের হারে মাধ্যমিক শিক্ষায় বিনিয়োগে পরিবারের যথেষ্ট উৎসাহ না থাকার কথা।

বলা বাহুল্য, শিক্ষাখাতে বিনিয়োগের লাভের হার সম্পর্কে আমাদের উপরোক্ত হিসাব গড় অনুমান মাত্র। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক বর্গের পরিবারে এবং শিক্ষার স্তরভেদে লাভের হারের তারতম্য হয়। সারণী-৬ এ আমরা জমির মালিকানা ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সদস্যদের শিক্ষার মান অনুযায়ী পরিবারের অনুমিত গড় আয়ের তথ্য পরিবেশন করেছি।

লক্ষণীয় যে, ভূমিহীন ও প্রায়-ভূমিহীন পরিবার শিক্ষা থেকে একেবারেই লাভবান হন না। এই শ্রেণীতে এমন কি মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত পরিবারের আয় অশিক্ষিত পরিবারের তুলনায় প্রায় একই। জরিপের এই ফলাফল বিস্ময়জনক। তবে ভূমিহীন পরিবার শিশুদের স্কুলে পাঠাতে কেন আগ্রহী নয় তার জবাব এই তথ্য থেকে পাওয়া যায়। এসব পরিবারের সদস্যগণ সাধারণতঃ অন্যের খামারে দিনমজুর হিসাবে কাজ করেন। এই পেশায় শিক্ষা কোন কাজে আসে না। কোন নিয়োগকর্তা একজন শিক্ষিত কৃষি শ্রমিককে অশিক্ষিতের তুলনায় বেশী মজুরি দেন না। শিক্ষা থেকে প্রাপ্ত দক্ষতা ব্যবসা বাণিজ্যে কাজে লাগিয়ে আয় বাড়ানো যায়—কিন্তু ব্যবসা বা অন্যান্য অকৃষিজ পেশায় আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন মূলধনের যা ভূমিহীন বা প্রায়-ভূমিহীন পরিবারের সদস্যদের পক্ষে সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য। এই শ্রেণীর পরিবারের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ পাওয়ারও যোগ্যতা কম—কারণ বন্ধকী দেয়ার মত কোন সম্পদ তাদের নেই। স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে পেশাভিত্তিক কাজে চাকরি যোগাড় করা হয়তো সম্ভব কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে ছেলেদের এত বছর স্কুলে রাখা এদের প্রায় সকলেরই সামর্থ্যের বাইরে।

অন্যদিকে পাঁচ একরের অধিক জমির মালিক এ ধরনের পরিবারে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ থেকে লাভ অত্যন্ত বেশী। এ শ্রেণীতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সদস্যগণ একেবারেই স্কুলে পড়েননি এরকম পরিবারের গড় বার্ষিক আয় ৩৬,৩২৮ টাকা, মাধ্যমিক স্কুলে পড়ে থাকলে বার্ষিক আয় প্রায় ৫৫,০০০ টাকা, আর মাধ্যমিক স্কুল উত্তীর্ণ হলে তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৮৮,০০০ টাকা। প্রতিবছর শিক্ষার জন্য আয় বৃদ্ধি প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে প্রায় ২,৮০০ টাকা আর মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে প্রায় ৪,৪০০ টাকা (১৯৮২-এর মূল্যস্তরে)।

উপরের ফলাফল থেকে প্রমাণিত হয় যে, আয় বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা একটি প্রয়োজনীয় শর্ত কিন্তু তা যথেষ্ট শর্ত নয়। শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে শ্রমের উৎপাদিকা ও আয় বাড়াতে হলে প্রয়োজন জমি ও মূলধনের ন্যায় অন্যান্য সম্পদের। বর্তমানে স্কুলে প্রদত্ত শিক্ষা শিক্ষিতকে কায়িক শ্রমবিমুখ করে, সেজন্য কৃষিতে শ্রমের যোগান ও উৎপাদিকা বৃদ্ধিতে শিক্ষা তেমন কাজে লাগে না। কিন্তু জমির মালিকানা পরিবারকে যোগায় প্রয়োজনীয় মূলধন, ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা এবং সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের সাথে যোগাযোগ, যা কাজে লাগিয়ে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি কৃষিকাজ থেকে নিজেকে মুক্ত করে অপেক্ষাকৃত বেশী লাভজনক এবং কম কষ্টকর অকৃষিজ পেশায় নিয়োগের মাধ্যমে নিজের স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিবারের আয় বৃদ্ধি করতে পারেন।

উপসংহার

উপরোক্ত ফলাফলের ভিত্তিতে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধির জন্য কি করণীয় তা আলোচনা করা যাক। দুই দিক থেকে বিষয়টিকে দেখা প্রয়োজন—(এক) শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে কি করে আয় আরো বাড়ানো যায় এবং (দুই) ব্যাপক দারিদ্র্যহেতু আমাদের সমাজে শিক্ষার যে সুযোগ ব্যয় রয়েছে তা কি করে কমানো যায়।

কর্মক্ষেত্রে শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হওয়ার জন্য মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যসূচীর কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। বর্তমান পাঠ্যসূচী ছাত্রকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে প্রস্তুত করার জন্য প্রণীত। কিন্তু যারা মাধ্যমিক স্তরেই স্কুল ত্যাগ করে তাদের জন্য এ পাঠ্যসূচী তেমন কাজে আসে না। এদের জন্য নিম্নমাধ্যমিক স্তর থেকেই কর্মজীবনে কাজে লাগে এ রকম বাস্তবভিত্তিক বিষয় পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। আধুনিক শস্য সম্পর্কিত জ্ঞান ও কৃষি উপকরণের উপযুক্ত ব্যবহার, পশু ও হাঁস-মুরগী পালনের সমস্যা ও আধুনিক পদ্ধতি, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান ইত্যাদি এ সবের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণের জন্য যে পাঠ্যসূচী ব্যবহার করছেন তা যথোপযুক্ত পরিবর্তনসাপেক্ষে মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

[illegible]

সারণী—৬ জমির মালিকানা ও প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যদের শিক্ষার স্তর ভেদে পরিবারের বার্ষিক আয়, ১৯৮২

(টাকা)

শিক্ষার স্তর	পরিবারের জমির মালিকানা: আধা একর পর্যন্ত	০.৫-২.০ একর	২.০-৫.০ একর	৫.০ একরের উপর
কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই	১২,১৬৫	১৩,৪১৩	২২,৪১৮	৩৬,৩২৪
দুই বছর পর্যন্ত	১১,৪৪৯	১৮,৯১০	২৮,৫৬৪	৪১,৯২২
৩—৫ বছর	১২,২৫২	১৯,৯১০	২৪,৪০৪	৪৭,৩১৫
৬—১০ বছর	১১,৬৫৫	২১,৬৪৮	৩১,১১৫	৫৫,০০০
১০ বছরের উর্দ্ধে	নাই	২৫,১৯৬	৪৮,১৮২	৮০,৮১৩
মোট	১২,০৩৯	১৭,১৩৬	২৬,২৬৯	৪[illegible],৬৯৩

উৎস: বি, আই, ডি, এস [illegible] ১৯৮২

[illegible] যাতে অকৃষিজ খাতে আত্মকর্মস্থানের ব্যবস্থা করে অর্জিত শিক্ষাকে কাজে লাগাতে পারে তার জন্য প্রয়োজন তাদেরকে সহজশর্তে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণদান। ভূমিহীন পরিবারের শিক্ষিত সদস্যদের বিনা বন্ধকীতে ঋণদানের ব্যবস্থা নেয়া উচিত। এ ব্যাপারে গ্রামীণ ব্যাংকের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যায়। মূলধন দিয়ে সাহায্য না করলে শিক্ষা উৎপাদনমুখী করলেও গ্রামের বিত্তহীন শ্রেণী তা থেকে তেমন লাভবান নাও হতে পারে।

আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষার গুণগত মানেরও যথেষ্ট উন্নয়ন প্রয়োজন। বর্তমানে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকদের অনিয়মিত উপস্থিতির কারণে শিক্ষার মান বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং অভিভাবকদের মনে স্কুল সম্পর্কে হতাশার সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষক নিয়োগে অব্যবস্থা (অনেক শিক্ষককে মোটা অংকের টাকা দিয়ে চাকরি নিতে হয়) এবং অভিভাবকদের কাছে শিক্ষকদের জবাবদিহির ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এ সমস্যার মূল কারণ। এর পরিবর্তনের লক্ষ্যে স্কুল ব্যবস্থাপনা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও অভিভাবক নিয়ে গঠিত কমিটির হাতে ন্যস্ত করা বিবেচনার দাবী রাখে। তাছাড়া মাধ্যমিক স্কুল উত্তীর্ণ মহিলাদের নিজ গ্রামের স্কুলে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। এর ফলে বালিকারা অধিক সংখ্যায় স্কুলে আসতে আগ্রহী হবে। এদের মধ্যে যারা মাধ্যমিক স্তর পাড়ি দিতে পারবে না তারাও পরবর্তী জীবনে দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে।

শিশুদের স্কুলে অংশ গ্রহণের সুযোগ ব্যয় কমানোর জন্য স্কুলের সময় ও ছুটি গ্রামের অর্থনৈতিক কাজকর্মের চাপের সঙ্গে সংগতি রেখে ঠিক করা প্রয়োজন। স্কুলে দুই শিফট চালু করলে দরিদ্র পরিবারের শিশুরা সকালের শিফটে শিক্ষা গ্রহণ করে

(৮-এর কঃ দেখুন)

দিনের বাকী সময় পরিবারের কাজে সাহায্য করতে পারে। ধান কাটার সময় কৃষির ব্যস্ত মৌসুম, যখন অনেক স্থানেই শ্রমের অভাব অনুভূত হয়। এই সময় স্কুল বন্ধ থাকলে শিশুরা কৃষিকাজে অংশ গ্রহণ করে পরিবারকে সাহায্য করতে পারে।

দরিদ্র পরিবার থেকে শিশুদের স্কুলে আকৃষ্ট করার জন্য সরকারী বিদেশী অনুদানে প্রাপ্ত খাদ্য সাহায্যের কিছু অংশ ব্যবহার করে স্কুল লাঞ্চ কর্মসূচী চালু করতে

(২-এর পাতায় দেখুন)

গ্রামীণ অর্থনীতি

(৬-এর পাতার পর)

পারেন। এতে শিশুদের বর্তমান পুষ্টিহীনতার অবস্থার উন্নতি হবে এবং দরিদ্র পরিবার থেকে শিশুদের স্কুলে পাঠানোর সুযোগ ব্যয় কিছুটা কমবে। মাথাপিছু ১৫০ গ্রাম হিসাবে ১ কোটি ২০ লাখ প্রাইমারী বিদ্যালয়গামী শিশুদের বছরে ২৫০ দিনের একবেলা খাবারের জন্য প্রয়োজন ৪ লাখ ৫০ হাজার টন খাদ্যশস্যের, যা বর্তমানে বিদেশী অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত খাদ্যশস্যের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর কয়েকটি উপজেলায় এই কর্মসূচী চালু করে শিশুদের স্কুলে অংশগ্রহণের উপর এর প্রভাব পরীক্ষা করে দেখা যায়। (সমাপ্ত)